প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্প

সুমিতা চক্রবর্তী

বিগত অর্ধশতাব্দীকাল যে কথাসাহিত্যিকরা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে গল্প এবং উপন্যাস লিখে চলেছেন এবং লিখন বৈশিষ্ট্যে সাহিত্যপাঠকদের কাছে হয়ে উঠেছেন সুপরিচিত--- তাঁদেরই একজন প্রফুল্ল রায়। তাঁর কথাসাহিত্যের ভুবনে একধরনের বিস্তার আছে। তিনি লেখেন মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন নিয়ে, উচ্চবিত্তশ্রেণীও মাঝে মাঝেই তাঁর লেখায় স্থান পায় , সেই সঙ্গে দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র বর্গের মানুষকেও তিনি গভীর ও নিবিড়ভাবে মূর্ত করেন তাঁর লেখার পৃথিবীতে। প্রফুল্ল রায়ের গল্পে ব্যক্তিমানুষ তার যাবতীয় সঙ্কট নিয়ে প্রতিভাত হয় আবার, শ্রেণী-মানুষকেও তিনি সতর্ক দৃষ্টিতে অনুধাবন করেন এবং শ্রেণী বিভক্ত সমাজের সংঘাতগুলিকে রূপায়িত করেন যথাযথভাবে।

প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্পের আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে সাহিত্যের এই শ্রেণী-মানুষ ও ব্যক্তি-মানুষের স্বরূপলক্ষণের বিষয়টি একটু পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। প্রত্যেক মানুষই শ্রেণী-মানুষ ও ব্যক্তি-মানুষ একই সঙ্গে। সে কোনো-না কোনো সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্গত। যে সমাজে তার জন্ম এবং বড় হয়ে ওঠা সেই সমাজের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এবং সামাজিক মূল্যবোধের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভিতর থেকে উদ্ভুত হয় তার ব্যক্তিত্ব । কাজেই প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিত্বকে তার নিজস্ব সামাজিক শ্রেণীরই এক ধরনের উৎসারণ বলা যায়।

এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষের 'ব্যক্তিত্ব' অভিধায় তার একক চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যকেও অস্বীকার করা যায় না। একই সামাজিক শ্রেণী ও পরিমণ্ডলভুক্ত; একই পরিবারের, একই বয়সের সম-শিক্ষিত তিনজন ব্যক্তির স্বভাব, মানসিকতা নীতিবোধ হয়ে যেতে পারে পৃথক। জীব-শরীরের রহস্যময় কোনো জিন-এর প্রভাব সক্রিয় থাকতে পারে এই স্বাতন্ত্র্যে, এই স্বাতন্ত্র্যের বৈচিত্র্যও প্রকৃতির নিয়মেরই অঙ্গ। কাজেই মানুষের ব্যক্তিত্ব আর শ্রেণীত্ব---এই দুই পরিচয়ই সমান সত্য।

সাহিত্যিক যখন বাস্তব পৃথিবীর প্রকৃত মানুষের প্রতিচ্ছবি রূপে নির্মাণ করেন 'চরিত্র' তখন তিনি এই শ্রেণীত্ব অথবা ব্যক্তিত্ব---কোন্ দিকটিকে গুত্ব দেবেন তা নির্ভর করে তাঁর নিজের লেখক মানস এবং শৈল্পিক অভিপ্রায়ের উপর। কোথাও তিনি তাঁর গল্পের কেন্দ্রীয় উপলব্ধি রূপে মানুষের শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেণী সংঘাতকেই তুলে ধরতে চান ; কোথাও তিনি উদ্ভাসিত করতে চান মানুষটির অন্তর্গত মনকে, তার ব্যক্তি পরিচয়কে। যদিও এমন কখনই সম্ভব নয় যে, সাহিত্যে রূপায়িত কোনো এক ব্যক্তি চরিত্র সম্পূর্ণভাবেশ্রেণী চরিত্র বর্জিত এক নির্মাণ হয়ে উঠল। অথবা , এমনও হতে পারে না যে শ্রেণী চরিত্র থেকে গেল ব্যক্তিত্বের সমস্ত পরিচয় থেকে বিচ্ছিন্ন। অবশ্য অপ্রধান চরিত্র হিসেবে কল্পিত হলে ব্যক্তিচরিত্র-বিহীন শ্রেণী মানুষ সাহিত্যে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু শ্রেণী চরিত্র বিহীন ব্যক্তি মানুষকে কল্পনা করা মনে হয় একান্তই অসম্ভব ।

শরৎচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যে চরিত্র-চিত্রণ প্রধানত ছিল ব্যক্তিত্বজ্ঞাপক । দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তীকালের সমাজ-পরিস্থিতি সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস শ্রেণী-সংঘাত এবং ব্যক্তিত্বের বৌনিক স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল সাহিত্যিকদের। তাই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর লেখায়; জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ,প্রেমেন্দ্র মিত্র, অতিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কথা সাহিত্যে --- এমন কী কাজী নজল ইসলামের গল্প উপন্যাসেও মানুষের শ্রেণী পরিচয় ব্যক্তি পরিচয়ের সঙ্গেই তাৎপর্যময় হয়ে উঠতে লাগল। লক্ষ করা যায় যে, আগে যেমন উপন্যাসের নামকরণ হত অনেক সময় ব্যক্তির নামে, এই সময় থেকেই সেই রীতি প্রায় বর্জিত হয়েছে এবং শ্রেণীর নামে, গোষ্ঠী জীবন কেন্দ্রিক অঞ্চলের উল্লেখে উপন্যাসের নামকরন শু

হয়েছে। এই সময় থেকেই আমরা সাহিত্যে শ্রেণী পরিচয় আর ব্যক্তিপরিচয়ের সম্মিলনে শিল্পিত ভিন্নধরনের চরিত্র পেতে শু করেছি। স্মরণ করা যেতে পারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চৈতালী ঘূর্ণী' উপন্যাসের কৃষক নায়ককে ; মানিক বন্দ্যো াপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের মৎস্যজীবী নায়ককে এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অনুবর্ত্তন' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র স্কুল-শিক্ষককে। এই চরিত্রগুলি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ধারণ করেছে শ্রেণীত্ব ও ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক রূপ লক্ষণ। পূর্ব উল্লিখিত চরিত্রগুলি সকলেই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি। কিন্তু যখন ছোটগল্প লেখা হয় তখন সাধারণত তার পরিসরউপন্যাসের চেয়ে ঘনতর হবার কারণে একটি চরিত্রের কোনো একটি বা দুটি দিকের প্রতিই লেখকের দৃষ্টি থাকে নিবদ্ধ। সম্পূর্ণতার উদ্‌ঘাটননয়, কোনো একক উপলব্ধির সঙ্কেত দ্যোতিত করাই ছোটগল্পকারের লক্ষ্য থাকে। সেকারণে ছোটগল্পে যখন একটি চরিত্রকে তুলে ধরা হয় তখন সাধারণত লেখক তাঁর শ্রেণীত্ব অথবা ব্যক্তিত্ব যে কোনো একটি দিককেই প্রধানভাবে তুলে ধরবার অবকাশ পান। রবীন্দ্রনাথ যখন 'দেনাপাওনা' ওথবা 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' লিখেছেন তখন চরিত্রগুলিকে উপস্থাপিত করেছেন প্রধানত শ্রেণী চরিত্র হিসেবে। কিন্তু যখন লিখেছেন 'খোকাবাবুর প্রত্য াবর্তন' অথবা 'হালদার গোষ্ঠী' কিংবা 'স্ত্রী-র পত্র' তখন কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলিব ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসনই তাঁর গল্পের বিষয়। বাংল া ছোটগল্পের ধারাবাহিকতা অনুসরণে দেখা যায়, যে-লেখকেরা বিশ ও তিরিশের দশকে গল্প লিখতে শু করেছিলেন তাঁর া তাঁদের বিভিন্ন গল্পে মানুষের শ্রেণীত্ব এবং ব্যক্তিত্ব উভয়কেই তুলে ধরেছেন বিভিন্ন গল্পে। গল্পের পরিকল্পনা অনুসারে কে াথাও প্রাধান্য পেয়েছে ব্যক্তি-মানুষ কোথাও তার শ্রেণী। চল্লিশের দশকে যাঁরা প্রগতি শিবিরের গল্পকার ছিলেন তাঁদের লেখায় মানুষের শ্রেণী পরিচয়টিই ছিল গুত্বপূর্ণ। ননী ভৌমিক, সুশীল জানা, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ লেখকের ছোটগল্পে প্রায় যান্ত্রিক একধরনের শ্রেণীকরণ আমরা দেখতে পাই। যেমন ধনী ও মালিক শ্রেণী যারা সর্বদাই নিষ্ঠুর, স্বার্থপর ও শে াষক। দরিদ্র শ্রমিকশ্রেণী তারা সবসময়েই উৎপীড়িত অসহায় এবং ত্রমে সভঘবদ্ধ ও প্রতিবাদী। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সর্বদাই দে ালাচলতায় আত্রান্ত। এইভাবেশ্রেণী অন্তর্গত ব্যক্তিকে তুলে ধরবার মধ্যে খুব সে ভুল ছিল-- তা কিন্তু নয়। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে এই সত্যটি আবৃত থেকে যেত যে, একই শ্রেণীভুত্ত ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ব্যক্তিত্বে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশও ঘটে। ধনী হলেই খারাপ হয় না, গরিব হলেই ভাল হয় না; এবং প্রতিটি শ্রেণীর অন্তর্গত মানুষের মনে থাকতে পারে মহত্ত্ব ও হীনতার বহুবিচিত্র এবং স্বতন্ত্র সমন্বয়। প্রখ্যাত তিন বন্দ্যোপাধ্যায়এবং জগদীশ গুপ্ত কিন্তু এই বিচিত্রতার শিল্প রূপাবয়ব নির্মাণ করতে পারতেন।

পঞ্চাশের দশকের গল্পকারেরা শ্রেণী মানুষ সম্পর্কে সচেতন থেকেও প্রধানত ব্যক্তি মানুষকেই তুলে ধরেছিলেন তাঁদের ছে াটগল্পে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু, বিমল কর প্রমুখ গল্পকারেরা যে অসামান্য শিল্পসৃষ্টি করে গেছেন সেখানে প্রাধান্য ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের । ষাটের দশকে 'শাস্ত্রবিরোধী' গল্পকারদের ব্যতিত্রম বাদ দিলে এই ধারারই প্রবাহ লক্ষ করা যায়। এই ধারার অন্তর্গত লেখক প্রফুল্ল রায় কিন্তু এ-বিষয়ে কিছুটা স্বতন্ত্র অবস্থানের অধিকারী। তাঁর জন্ম ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০-৫২ পর্যন্ত কালপর্বে পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দু মধ্যবিত্ত যে র াজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিপন্নতার মধ্যে দিন অতিবাহিত করেছিলেন তাঁদেরই একজন ছিলেন তিনিও। দেশবিভাগের পর বাস্তুহারা মানুষের সঙ্গে তিনিও চলে আসেন পশ্চিমবাংলায় এবং কলকাতায়। তারপর তাঁর যে জীবন সংগ্রাম শু হয় তার প্রধান ক্ষেত্র ছিল লিখন পঠনের জগৎ । তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্রে কাজ করেছেন এবং যুত্ত থেকেছেন বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গেও। দায়িত্বশীল ও প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক হিসেবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল-- বিশেষ করে বিহার , উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ ; মহারাষ্ট্র ও গুজরাট প্রভৃতি তিনি পরিভ্রমণ করেছেন , বাস করেছেনএবং সাংবাদিক পর্যবেক্ষন শত্তির অধিকাংশও তিনি এইসব অঞ্চলে বসবাসকারী নাগরিকদের বিভিন্ন স্তর এভং শ্রেনীকে সামগ্রিক রাষ্টীয় ও সামাজিক পরিমন্ডলের প্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষ বুঝে নিতে পেরেছেন । তার ফলে তাঁর গল্পে ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন শ্রেনীভুত্ত নাগরিকের শ্রেনী বৈশিষ্ট্যকে তিনি সহজেই চিত্রিত করতে পারেন । সেখানে তিনি গল্পে প্রধান ভূমিকা দিয়েছেন জীবনের ব াস্তবতাকে ।

কিন্তু প্রফুল্ল রায়ের গল্পে খুব বেশি এমন দেখা যায় না যে মানুষ কেবলই শ্রেনীত্বের নিরিখে পরিচিত হল । ব্যক্তি - মানুষের নিজস্ব আশা -আকাঙ্খা , স্বপ্ন -সাধ, দীনতা হীনতা এবং মহত্ব এইসব গুণ ও দোষসহ ব্যক্তি মানুষকে প্রত্যক্ষ দেখা এবং

দেখানোর দিকেও তাঁর শিল্পী মানসের একাগ্র দৃষ্টি থাকে । বস্তুত প্রফুল্ল রায়ের ছোট্টগল্পের খানিকটা স্বাতন্ত্র্য এখানেই -- তিনি একজন ব্যক্তি কে সম্পূর্নতই তার শ্রেণী অন্তর্গত বিশিষ্টতায় স্বাভাবিক রেখেও তার ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যকে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করেন । প্রফুল্ল রায়ের বেশ কিছু গল্প আছে সেখানে এই বিরল সামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ করা যায় --য়েখানে একজন মানুষ তার শ্রেনীত্ব এবং ব্যক্তিত্বের সম্মিলন জনিত সমগ্রতা নিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে । পাঠক সেখানে তার শ্রেনীগত দিকটিকেও প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করবেন । এবং মনে রাখবেন চরিএটির ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকেও ।

কিন্তু মানুষের এই ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলবার শিল্পকর্মে প্রফুল্ল রায়ের নিজস্ব ব্যক্তিমানসের একটি প্রবনতা লক্ষ করা যায় । শিল্পী হিসাবে তিনি সেই ধারার অন্তর্গত যে ধারার শিল্পীর বিশ্বাসে "মানুষ কোথাও ভাল রয়ে গেছে "। প্রায়শই তাঁর গল্পে মানুষ তার আত্মপরায়নতাকে অতিক্রম করে মহৎ হৃদয় বৃত্তির পরিচয় দেয় । সেখানে সে নিজের স্বার্থকে অতিক্রম করে , এমন কী বিপদে পড়বার ঝুঁকি ও গ্রহন করে বার বার । এমন জীবনে হতে পারে না তা নয় । কিন্তু গল্পে যদি কোনো চরিত্রের ক্ষে.ত্রে এই মহত্তর কেপ্রতিষ্ঠিত করতে হয় তা হলে যথেষ্ট পরিমান কারন -কার্য শৃঙ্খলের যৌক্তিক পারম্পর্য রক্ষা করা দরকার । হঠাৎ মানুষ ভালো হয়ে গেল; হঠাৎ মানুষ মানুষের ভালো করবার জন্য নিজের বিশ্বাস ও সংস্কার বহির্ভূত কাজ করল ---এমন যদি বারবার ঘটতে থাকে লেখকের গল্পে তাহলে তিনি কিছুটা সরলীকরণের আশ্রয় নিয়েছেন একথা বলতে হবে । এই সরলীকরণ রায়ের গল্পের শিল্প গুণকে কিছু ব্যাহত করেছে কোথাও কোথাও । আমরা যথাস্থানে তার দৃষ্টান্ত দেখব যদিও এই প্রবনতাই সম্ভবত তাঁকে করেছে একজন জনপ্রিয় গল্পকার । সাধারন পাঠক, যে পাঠকেরা স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন আকাঙ্খা করেন ; জীবনের জটিলতার অতল গহ্বরে বেশি নামতে পছন্দ করেন না --তাঁরা শিল্পের মধ্যে ও এই সান্ত্বনার প্রতিফলন দেখতে চান যে দোষে গুনে মানুষ শেষ পর্যন্ত ভালোই ;এবং সেকারনে পৃথিবী এখনও বাসযোগ্য। তবে এ কথাও স্মরন যোগ্য য়ে প্রফুল্ল রায় স্বভাবত শক্তিমান এক সাহিত্যিক । বহুগল্পকেই তিনি সত্যের দিক থেকে আর শিল্পের দিক থেকে একই সঙ্গে উত্তীর্ন করে দিতে পেরেছেন।

যে কোনো লেখকের শিল্পকর্মেই তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপাদান অত্যন্ত গুত্বপূর্ন হয়ে দেখা দেয় । এমন কথা কখনও কখনও বলা হয়ে থাকে যে দেশবিভাগের মতো এত বড় একটি ঘটনা বাংলা সাহিত্যে তেমন গুত্বের সঙ্গে স্থান পায়নি । কথাটি আংশিক সত্য । অজস্র না ঘটলেও বেশ কিছু গল্প উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবনের সঙ্কট রূপায়িত হয়েছিল পঞ্চাশের দশকেই । উপরন্তু আর একটি বিষয় লক্ষ করা য়ায় -- অনেক লেখক ,ঠিক তখনই না হলেও বেশ কিছুকাল পরেও ; ষাটের সত্তরের , আশির দশকেও দেশবিভাগের বাস্তবতার বিভিন্ন দিক অবলম্বন করে ছোটগল্প লিখেছেন । এই যে বারবার ক্ষতের মুখে স্মৃতি র বিষ নতুন করে জমা হয় তার একটি ঐতিহাসিক কারন আছে । পশ্চিম বাংলা ও পূর্ববাংলা , পরবর্তীকালে পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে একটি স্থিতিহীনতার কম্পন সবসময়েই অনুভুত হয়েছে । এখনও পর্যন্ত তার নিরসন ঘটেনি । এখনও বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা ধীরে ধীরে পুনর্বাসন খুঁজে নিচ্ছে ভারতে ; এখন ও ভারত ছেড়ে যাওয়া মুসলমান ভদ্রলোকেরা বার বার পশ্চিমবাংলায় আসছেন এবং যাচ্ছেন । কখনও তা স্মৃতির অবগাহনের অভিলাষে ;কখনও সাহিত্য -সংস্কৃতি পঠন -পাঠনের উদ্দেশ্যে ;কখনও বাণিজ্যিক বিনিময় অথবা চিকিৎসার জন্য । এখনও সর্বাধিক সংখ্যায় সীমান্ত পারাপার করে থাকেন দরিদ্রবর্গের হিন্দু ও মুসলমান ভারতীয় ও বাংলাদেশী সকলেই নিতান্তই গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের বাধ্যতায় । কাজেই দুই বাংলার থাকা এবং হয়ে যাওয়া --এর মধ্যে সম্পর্ক বন্ধনটি এখনও খুব জীবন্ত । আমরা পঞ্চাশ ষাট সত্তরের দশকের বহু গল্পকারকেই দুই বাংলার মানুষের বিচিত্র দুর -নিকট সম্পর্ক নিয়ে গল্প লিখতে দেখেছি। প্রফুল্ল রায়ের রচনাসম্ভারে এই বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে থেকে লেখা গল্পের সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।

গল্পের নাম 'রাজা যায় রাজা আসে'। দিন-আনা-দিন-খাওয়া ঘরের ছেলে খালে বিলে মাছ ধরে বিক্রি করা; ধান ও পাটের খেতের মুনিষ খাটা— এভাবেই চলত। যাদের কাছে খাটত তারা বড়লোক। রাজেকের কাছে সেটাই তাদের শ্রেণী— হিন্দু-মুসলমান ভেদ নিয়ে কোনদিন ভাবেনি সে। বৈকুণ্ঠ সাহা আর তোরাব আলি উভয়েই খেতখামারি তাদের ক

াছে এক। দেশের স্বাধীনতার ব্যপারটা নিয়েও ভাবেনি সে। তার মত গরিবের কি আর আসে যায় পতাকার রং বদলে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ সাহা যখন চলে গেল পশ্চিমবাংলায় তখন রাজেকের হাতেই দিয়ে গেল বিষয় সম্পত্তি। শর্ত সবই সে ভোগ কক কিন্তু যদি কখনও বৈকুণ্ঠ সাহা ফিরে আসে তখন তাকে ফিরিয়ে দেবে সব। অতঃপর রাজেকের জীবনে সুখের বান। দিব্যি ভদ্রলোক হয়ে উঠল সে। একদিন যার খেতের মুনিষ ছিল সেই তোরাবআলি মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চায়। সেই মেয়ে কামরণের দেমাকে মাটিতে পা পড়ত না— এখন সে মিষ্টি হেসে মুখ নামায় রাজেককে দেখে। এমন সময়ে বৈকুণ্ঠ সাহা ফিরে আসে— সঙ্গে আমিন সাহেব। রাজেকের হাজার প্রশংসা শুনিয়ে সে বলে— ''আমিন সাহেব ইন্ডিয়ায় থাকব না । মুশ্‌শিদাবাদে তেনার ঘর দুয়ার খ্যাতখামার যা আছে আমাদের দানপত্তর কইরা দিব। পাকিস্তানে আমার যা আছে তোমারে দিমু। ব্যাপারটা অইল 'এচেঞ্জ' (এক্সচেঞ্জ) বাংলায় কয় বিনিময়— এই বিনিময় তাদেরই মধ্যে ঘটতে প ারে যাদের আছে বিনিময়যোগ্য সম্পত্তি । কাজেই সম্পত্তি হস্তান্তরিত হল। তোরাব আলির মেয়ের স্বপ্ন মিলিয়ে গেল হ াওয়ায় । আবার পলো নিয়ে,জাল নিয়ে সুতো-বঁড়শি নিয়ে খালে বিলে বেড়ায় রাজেক। আবার নামে মাঠে । চামড়ায় ওড়ে খই। নিজেকে সে বলে— ''দ্যাশের একরাজা যায়, আরেক রাজা আসে, তাতে তর কী রে, তর কী?''— দেশবিভ াগ সম্পর্কিত বহু আবেগ-নিষিক্ত গল্প আমরা পড়েছি। কিন্তু বিত্ত পার্থক্যে যে সামাজিক শ্রেণীকরন— তার এমন নির্ভূল প্রতিবিম্ব দেশভাগের দর্পনে আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। দেশ বিভাগ নিয়ে লেখা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিখ্যাত পালঙ্ক গল্পে বিত্ত পার্থক্যের কঠিন বাস্তবের উপর হৃদয়াবেগের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। এখানে তা হয়নি।

দেখা যাক আর একটি গল্প। এক দেশ ভেঙে দুই দেশ হওয়া; অর্থনৈতিক অ-নিরাপত্তা; সীমান্ত পারাপারের বহুশাখায়িত বাস্তবতা এবং দেশের রাষ্ট্রিক কূটনীতির গতি - প্রকৃতির সঙ্গে কেমনভাবে জড়িয়ে থাকে দরিদ্র মানুষের জীবন— তার এমন সত্য চিত্রণ অল্পই পাওয়া যায়। প্রফুল্ল রায়ের কর্মজীবনের দীর্ঘ অংশ অতিবাহিত হয়েছে সাংবাদিকতার কাজে। দেশ - কালের যে ছবি তিনি তুলে এনেছেন তা সাংবাদিকের ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছাড়া জানা ও বোঝা সম্ভব নয়। গল্পের নাম 'অনুপ্রবেশ'। উত্তর বিহারের জাতীয় সড়ক ধরে ভোর রাতে আটজন মানুষের নিঃশব্দ সঞ্চরণ। ফরিদ ও রাশেদা— ত াদের পরিবারের বৃদ্ধা থেকে শিশু। দলনেতা শওকত। প্রথমেই বিস্ময় জাগে আমাদের । তাহলে সীমান্ত পার হয়ে হিন্দুরা আসছে না । আসছে মুসলমানেরাই । তারা কারা এবং কেনই বা আসছে? এই প্রশ্নের দীর্ঘ-জটিল উত্তর নেই এই গল্পে। স াতচল্লিশের দেশভাগের সময়ে তাদের বাপ-দাদারা বিহার থেকে গিয়েছিল ঢাকায়। গরিব মানুষের জীবন এক রকম চলে যাচ্ছিল গরিবিয়ানার চালেই। কিন্তু এসে যায় ১৯৬৯- ৭০- ৭১; ঘনিয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালি আর অবাঙালি মুসলম ানদের মধ্যে সুতীব্র ঘৃণা আর শত্রুতার সম্পর্ক তখন। এই বিহারি মুসলমানেরা চিরকালই উপেক্ষিত থেকেছে সেই ১৯৪৭ থেকে। বিহারের সাতচল্লিশের দাঙ্গায় ঘর ছাড়া হয়েছিল তারা। পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানেরা তাদের অ াপন করেনি, আবারলাহোর করাচির উর্দুভাষী মুসলমানেরাও তুচ্ছ করেছে তাদের। একাত্তরের মুক্তি যুদ্ধের কালে তারা সর্বতোভাবে সহায়হীন। শেষ পর্যন্ততারা স্থির করে ফিরে যাবে পূর্বপুষের স্বদেশ সেই বিহারেই । শু হয় পথ চলা । প্রথমে টাউটদের টাকা দিয়ে বর্ডার পার হওয়া । তারপর কলকাতা-কাটিহার-কামতাপুর হয়ে বারৌলি-র একটি কোণ দিয়ে ইন্ডিয়াতে ঢুকে পড়া। সেখানেই বা তাদের জায়গা দেবে কে?তারা বিদেশি অনুপ্রবেশকারী। ওদেশের দেহাতি ভাষায় ঘুসপৈঠিয়া। কিন্তু জায়গা হয়। কারণ সামনে ভোট । স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে বড় তাৎপর্যের ঘটনা— চুনাও। অঞ্চলের বিশিষ্ট ভোটপ্রার্থী রামবনবাস চতুর্বেদী তাদের রেশন কার্ড করিয়ে দেন । নাম উঠে যায় ভোটার লিস্ট-এ। প্রতিপক্ষ ভে াটপ্রার্থী সংবাদ পাবার পর অনুপ্রবেশকারীদের বিদ্ধে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি করে তার লোকজন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান হয়েই যায় তারা। ব্রিটিশ আমলের ভারতীয় পূর্ববাংলায় পাকিস্তানি, তার পর বাংলাদেশি, তার পর আবার ভারতীয়। র াষ্ট্রনীতির কলমের আঁচড়ে বদ্‌লে যায় মানুষের স্বদেশ। বিহারি মুসলমানদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কমই লেখা হয়েছে। প্রফুল্ল রায় বিহারের এবং বর্তমান ঝাড়খন্ডের দরিদ্র বর্গের মানুষকে নিয়ে লিখেছেন অনেক । বাস্তবতার প্রত্যক্ষণে সেসব লেখা মর্মস্পর্শী ও গুত্বপূর্ণ। যদিও লিখনশৈলী আলাদা— তবু মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গেই এক্ষেত্রে নাম করা চলে তাঁর।

দেশ বিভাগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মানুষকে নিয়েও তিনি লিখেছেন। 'রক্তকমল' গল্পে মুসলমান আজম পালা গায় গ্র

ামের গানের দলে। বিভোর হয়ে থাকে— মনসামঙ্গল গানের লখিন্দর বেহুলার আখ্যানে। তারপর একদিন কারা এসে বলে যায়— পড়া চলবে না হিন্দুর কাব্য। আজমের বাবা তাকে গানটান ছেড়ে অন্য কাজে মন দিতে বলে। কিন্তু আজম এসে মিলে যায় বিপ্লবী ছাত্রদের মিছিলে। লেখে নতুন গান— "বাংলা মায়ের চুল ধইরাছে দুষ্ট দুঃশাসন—
তোমার বুকে রক্ত নাই কি বাঙ্গালী সুজন?" প্রমাণিত হয় আদি মহাকাব্যের চিত্রকল্প কোনো বিশেষ ধর্মের নয়,।

দেশভাগ ও মধ্যবিত্ত বাঙালির মন নিয়েও গল্প আছে— একাধিক। কয়েকটি লেখা গতানুগতিক। যেমন, 'জনক'। ব্রাহ্মণ শেখরনাথ অনেকদিন পর্যন্ত ভেবেছিলেন যে ধল্লেশ্বরীর পাড়ে এই মীরপুরে বহু প্রজন্মের শিকড় নামানো বসবাসে কোনো ব াধা আসবে না পাকিস্তান আমলেও। নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে হারালেন স্ত্রী হেমলতাকে। বাড়িতে দাঙ্গাকারীর দল এসে আক্রমণ করাতে হেমলতা মারা গেলেন। একমাত্র কন্যা খুকুকে তুলে নিয়ে গেল তারা। শেখরনাথ কলকাতায় চলে এলেন। প্রতিষ্ঠিত হল পুত্র সন্দীপ। তার পর একদিন মধ্য বয়স্কা বিবাহিতা কন্যা এসে দাঁড়াল বাপের বাড়ির দরজায়। সেদিন তণ সরকারি অফিসার হান উদ্ধার করেছিল তাকে। অনেকদিন এর চেষ্টাতে কোনো সন্ধান করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত খুকুকে সে বিবাহ করে। এখন তারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুখী। শেখর নাথ প্রথম দিন দরজা বন্ধ করে মুসলমানকে বিবাহ করা মেয়েকে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের গ্রহণও করেন। ব্রাহ্মণত্বের সংস্কার ভেঙে যাবার গল্প হিসেবে ভালই। কিন্তু প্রশ্ন থাকে হান যদি উচচপদস্থ চাকুরে না হয়ে হত গরিব শ্রমজীবি— তাহলেও কি অপত্যস্নেহের জোরে সংস্কারের বেড় া ভাঙত!

দেশ বিভাগ মনস্তত্ত্বের আর সমাজ-সূত্রের আরও অনেক গল্পই আছে। আর একটিমাত্র গল্পের উল্লেখ করে প্রসঙ্গান্তরে য াব। গল্পের নাম 'বিদেশী' । সাতচল্লিশের দেশভাগের সময়ে ঢাকা জেলার সজিতপুরে থাকতেন চার বন্ধু। একজন মুসলম ান, তিনজন হিন্দু। হিন্দু বন্ধুরা তিনজনেই কলকাতায় চলে আসেন। বহুকাল পরে সফল ও ধনী ব্যবসায়ী আলতাফ কলক াতার এক হোটেল থেকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে যোগাযোগ করেন বন্ধুদের সঙ্গে। একজন মারা গেছেন। এক বন্ধু মনিমোহন ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। দারিদ্র্যের মধ্যেই দিন কাটে তাঁর। তাঁর গরিব সংসারে নিমন্ত্রিত হলেন আলতাফ। মনিমোহনের স্নিগ্ধ মেয়েটিকে দেখে মন ভরে যায় তাঁর। পিতার সংসারের সব ভারই তার ওপর। পরের দিন আলতাফ য ান আর এক বন্ধু অম্বিকার বাড়িতে। তিনি অত্যন্ত ধনবান হতে পেরেছেন। আলতাফ সহসা এক আবেগ-বশে অম্বিকার ছেলের সঙ্গে মনিমোহনের মেয়ের বিয়েরপ্রস্তাব করেন। অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে আসে। অম্বিকা বলেন— "তুমি বিদেশী। দুচারদিনের জন্য ইন্ডিয়ায় এসেছ। গল্প কর, আড্ডা মারো। এসবের মধ্যে থেকো না।" দেশবিভাগের বাস্তবতা যেন কাঁট াতারের বেড়া নামিয়ে দেয় আলতাফ ও তাঁর বন্ধুদের মধ্যে। গল্পটির পরিকল্পনায় আছে স্বাভাবিকতার সঙ্গতি। স্বাভা বিকতাই অনেক সময়ে দুঃজনক।
বিত্তের অসমতাজনিত কারণে বহু বিভাজিত হয়ে গেছে এদেশের নাগরিকেরা। দরিদ্রবর্গের মানুষ যারা , নিজেদের জীবনকে মান্য সাহিত্যে শিল্পরূপ দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। তাদের কথা উঠে আসে লোক - কথায়, লোকায়ত গানে ও ছড়ায়। লোকসাহিত্য সর্বদাই গোষ্ঠী-জীবনের সাহিত্য। অর্থাৎ মানুষকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে নয়, গোষ্ঠীগত রূপেই সেখানে দেখা হয়। মান্য সাহিত্যে গল্প উপন্যাসে , নাটকে, চলচ্চিত্রে যখন রূপায়িত করা হয় তখন সাধারণতই প্রতিফলিত হয় ত াদের গোষ্ঠী-জীবন -পরিচয়। তার কারণ অনুমেয় সহজেই। যাঁরা নির্মাণ করেন এই শিল্প তাঁরা সকলেই মধ্যবিত্ত বর্গের ম ানুষ। তাদের চোখে ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ স্বভাবতই শ্রেণী রূপে দেখা যায়। ব্যক্তি রূপে সেই শ্রেণীর মানুষদের ভিতর মনকে স্বতন্ত্রভাবে অনুভব করবার মতো নৈকট্য প্রায়ই থাকে না এই শিল্পীদের। তা থাকা সম্ভবও নয়। ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিকহলেও বলতে ইচ্ছে করে ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ব্যক্তিমনের নৈকট্যে যতটা যেতে পেরেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আর সতীন াথ ভাদুড়ী বোধহয় পরবর্তীকালে আর কেউ পারেন নি ততটা। তবে শ্রেণী হিসেবে দরিদ্রবর্গের মানুষকে সাহিত্যে রূপা য়িত করবার কাজে আধুনিক বাঙালি লেখকরা আশাতীত সফল।

প্রফুল্ল রায় এই দরিদ্র বর্গের মানুষকে নিয়ে যে সব গল্প লিখেছেন তার অধিকাংশই বিহার, ঝাড়খন্ড, উত্তরপ্রদেশের

জনজীবনের চিত্র। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রও আছে। আমরা আগেই বলেছি, সাংবাদিক হিসেবে এই জনজীবনকে পর্যবেক্ষণ করবার অবকাশ পেয়েছিলেন তিনি । সাংবাদিকের পর্যবেক্ষণ বলেই এই শ্রেণীর সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও রাষ্ট্রের শাসক-শ্রেণীর সম্পর্কের সূত্রগুলি তিনি যথার্থ ভাবে তুলে আনতে পেরেছেন তাঁর গল্পে। বিশেষ করে নির্বাচন বা 'চুনাও' তাঁর গল্পে একটি পুনরাবৃত্ত পরিস্থিতি। কারণ সাধারণনির্বাচনই স্বাধীন ভারতের সেই একমাত্র ঘটনা যখন ক্ষমতাবান শ্রেণীর কাছে শোষিত বর্গের মানুষ প্রকৃত অর্থে গুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রফুল্ল রায়ের কয়েকটি বিশিষ্ট উপন্যাসেও এই অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টি কোণের প্রতিবিম্বন ঘটেছে। যেমন আকাশের নীচে মানুষ 'ধর্মান্তর', 'রামচরিত্র'। প্রধানত আশির দশকেই এ-জাতীয় গল্প উপন্যাস বেশি লিখেছেন তিনি।

বাস্তব চিত্রণের দিক থেকে গল্পগুলি খুবই আকর্ষক। দলিত বর্গের মানুষ ও তথাকথিত উচচবর্গের মানুষের মাঝখানে আছে ঘাতক সেনাবাহিনী ; আছে অপরিমেয় ঘৃণার পাঁচিল ; আছে ভু-সম্পত্তির প্রতি অপরিসীম লালসা। দেশের পুলিশ বাহিনী এই লোভী, বিবেক হীন, হিংস্র উচচবর্গের মানুষেরই সেবক, গরীবের নয়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ভূমিহার, রাজপুত যাদবেরা একদিকে ; অন্যদিকে তাৎমা,গাঙ্গোতা, দোসাদ, গোঞ্জু, কোয়েরি, চামার। এই দুই শ্রেনীর মানুষের বৈপরীত্য অনুপুঙ্খে তুলে ধরেন তিনি। সেই সঙ্গে আছে নারীর প্রতি পৃথক নির্যাতনের চিত্র— যা সব সমাজেই সত্য। ভূস্বামী আর ভূমিহীনের এই অন্তহীন সংঘাত মূর্ত হয় প্রফুল্ল রায়ের গল্পে। তিনটিগল্পের দৃষ্টান্ত দেব। 'বর্ষায় একদিন ' গল্পের একটি চরিত্র নাথুনি । মধ্য তিরিশের নারী । দু-দিন উপোসের পর নিজের গাঁও ছেড়ে চলেছে নানকিপুরা টৌন-এ ; সেখানে যা - হোক কিছু করে ছাতু- আটা কিনে ঘরে ফেরার আশায়। পথে দেখা তারই মতো একটি লোকেরসঙ্গে। সে-ও চলেছে নানকিপুরায় কাজের খোঁজে । দুজনেই রিত্ত। তবু নাথুনি বিশ্বাস করতে পারে না লোকটাকে । নির্জন রাস্তায় মরদ-কে বিশ্বাস কী? ক্রমশ আলাপ হয়। সংশয় একটু কাটে। পথে দেখা হয় একটি জীর্ণ মোটরগাড়ি ও তার চালকের সঙ্গে। চেচক আক্রান্ত দুই বুড়ো বুড়িকে নিয়ে গাঁও থেকে 'অসপতাল'-এ পৌঁছে দিতে চলেছে সে। কিন্তু 'কাচিচ' রাস্তার কাদামাটিতে ফেঁসে গেছে চাকা।বর্ষার রাস্তা-গাড়ি চলবেই না এখন । ঠেলে নিয়ে যেতে হবে গাড়ি কিন্তু একা হাতে চৌপটলাল কী করে গাড়ি ঠেলবে? এই আদমি আর আওরৎ কি হাত লাগাবে একটু ? দু-জন মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। তার মানে আর একদিন উপোস। তবু না বলতে পারে না। খালি পেটেও — তাদের চেয়েও অসহায় দুটি মানুষকে চিকিৎসার সুযোগের বৃত্তে পৌঁছে দিয়ে সেই বর্ষার দিনে একটু তৃপ্তি পায় তারা।

আপাত ভাবে মনে হতে পারে পরিস্থিতি নিষ্ঠুরতাকে কোমল পরিণামে সহনীয় করে দিলেন লেখক। কিন্তু গল্পটি পড়লে তেমন লাগে না। প্রথম কারণ বর্ণনার স্বাভাবিকতা । নাথুনি আর লাখুয়া ছাড়াও ড্রাইভার চৌপটলাল অদ্ভুত স্বাভাবিক একটি চরিত্র। নানকিপুরা-র এক মোটর গ্যারাজে কাজ করে সে । নেহাতই মানবিকতার দায়ে এই বুড়ো-বুড়িকে তুলেছে গাড়িতে। এরকম মানুষ কিন্তু নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আদৌ বিরল নয়। এই পরোপকারের কাজটি করেছে বলে নাথুনি আর লাখুয়ার সর্বহারা জীবনের সংগ্রাম এতটুকুও কম করে দেখানো হয়নি— এখানেই গল্পটির সার্থকতা।

'সাতঘরিয়া' গল্পের দোসাদ জাতের মেয়ে চাঁপিয়ার বিয়ে যাচ্ছে সপ্তমবার। এর আগে সে ছ'বার বিয়ে করেছিল— কোনো বিয়ে প্রেমের নয়, খাওয়া পরার দায়ে। প্রথম স্বামী মুঙ্গিলাল ছিল রাজপুত মালিকের কামিয়া। সে মরে গেলে মালিকের মুনিশ রাখনি রাখতে চেয়েছিল চাঁপিয়াকে। চাঁপিয়া মানেনি । দ্বিতীয়বারের চুমৌনা রিক্স- চালক চৌপটলালের সঙ্গে —নিজের খাওয়া নিজে জোটাবার শর্ত। খরায় চাষ বন্ধ হলে তা পারে না চাঁপিয়া। বিয়েও ভেঙে যায় । এমন করে আরও চারবার। সপ্তমবার নাটোয়া নামক লোকটি তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়— যদি তার খেতের মালিক পছন্দ করে তাকে।

চাঁপিয়ার তখন বয়স চল্লিশ। দেহ শীর্ণ । মালিকের পছন্দ হয় না, বিয়েও হয় না। নিরন্ন আর ভূমিহীন শ্রেণীর মানুষের বিবাহ সর্ত আমাদের সামনে ঐ শ্রেণীর রিত্ততার ছবি তুলে ধরে। সমস্ত ব্যবস্থাটাই কিন্তু ঐ পরিবেশে সব পক্ষের কাছেই নিত

ান্তই স্বাভাবিক। লেখকের গল্পের ভাষাতেও সেই নিরাবেগ বিবৃতি। চাঁপিয়া ফিরে আসে, কিন্তু একা নয় । বুড়ো গৈবীন াথও নিজেকে বিক্রি করতে এসেছিল সেই হাটে। তাকেও পছন্দ হয়নি কারোর। চাঁপিয়া নিয়ে আসে গৈবীনাথকে । তার সপ্তমবারের এই রিক্ত বিবাহই বোধহয় তার জীবনের শর্তহীন দাম্পত্য গড়ে দেবে।

তৃতীয় গল্পটির নাম বাজি। নায়ক দু-জন । 'কেহরগঞ্জ টাউনের দুই নাম করা জুয়াড়ি মোটেরাম এবং চুহালাল।" টাঙ্গা চ ালায় আর জুয়া খেলে। পাকা জুয়াড়ি দুজনেই এবং অত্যন্ত সততাসম্পন্ন জুয়াড়ি। টাকা বাকি পড়ে গেলে পরে কোনো সময়ে হারের টাকা শোধ দিয়ে যাবেই তারা। ঘটনাচক্রে অঞ্চলের চুনাও-এ তারা দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর কর্মী হয়ে যায়। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর একজন তেল-ব্যবসায়ী, অপর জন সুদে টাকা খাটায়। দুই বন্ধু প্রায় শত্রু হয়ে ওঠে। উত্তেজনার মুহূর্তে বাজি ল াগায় নিজের নিজের ক্যান্ডিডেট-এর পক্ষে । দু-জনেই প্রাণপণ খেটে জমিয়েছে বাজিরও তিনশো টাকা। এই গল্পটির সূত্রে বিহারের একটি ছোটো গঞ্জের নির্বাচনের চিত্র চমৎকার ফুটে ওঠে পাঠকের সামনে। ফল বেরোয় । দুই ক্যান্ডিডেট-ই হেরেছে। জব্দ হয়েছে জামানত। মোটেরাম আর চুহালাল সহসা বুঝে নেয়— "তিনশ পাইয়া বিলকুল বচ্ গিয়া। মক শ াসে তেলবালা আউর মক্ষিচুষ" —এভাবেই প্রফুল্ল রায় বিভিন্ন স্তরের দরিদ্রবর্গের মানুষকে জীবন্ত করে তোলেন। তাঁর গল্পের বয়ন কুশলতায় বাস্তবের নির্মমতা প্রত্যক্ষ থাকে কিন্তু মানুষের নৈরাশ্য-নিমগ্ন আত্মবিনাশই শেষ কথা হয় না। অতি দ্ররিদ্র শ্রেণীর অফুরন্ত জীবনী শক্তি, মনোভিত্তি মূলের মানবতাবোধ, এমনকী স্বচ্ছ জীবন-ধারণা ও পরিহাসবোধও উঠে অ াসে তাঁর গল্পে। এর কোনোটাই কিন্তু লেখকের বানানো নয়। ঐ বিপুল প্রাণশক্তি না থাকলে বিকাশশীল দেশের গবির ম ানুষেরা আজও কি বেঁচে থাকতে পারত!

মধ্যবিত্তদের মধ্যে এখন দুটি শ্রেণীর অস্তিত্ব খুবই সুস্পষ্ট। একটি স্তরকে উচচ-মধ্যবিত্ত বলা যায়। আঢেল ঐর্শ্য নেই, কিন্তু উচচ-মধ্যবিত্তরা ভোগ্যপণ্য অনেকটাই করায়ত্ত করতে সক্ষম। বিভিন্ন ভাবে তারা আরও বিত্তের অধিকারী হতে চায়। অ ার একটি স্তরের জীবনযাপন অভাবের মধ্যেই। মধ্যবিত্ততা সেখানে ঝুঁকে আছে নিম্নবিত্ততার দিকে। কিন্তু যে -স্তরের মধ্যবিত্তকেই গল্প-বিষয় রূপে গ্রহণ করা হোক—এ জাতীয় গল্পে প্রফুল্ল রায়ের দৃষ্টিভঙ্গির দুটি দিক সক্রিয় বলে মনে হয়। প্রথমত, গল্পগুলিতে তিনি চরিত্রগুলিকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি চরিত্ররূপেই দেখেন। দ্বিতীয়ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের চিত্রনে লেখকের সুনিদিষ্ট একটি মুল্যবোধ কাজ করেছে। নৈতিকতার একটি ভিত্তি তিনি যেন শিক্ষিত নর-নারীর চরিত্রে দেখতে চান। প্রায়ই তাঁর গল্পে এই নৈতিকতার জয় দেখানো হয়েছে। কোথাও কোথাও নৈতিকতার এই প্রতিষ্ঠা ঈষৎ 'বানানো' যে মনে হয় না তা নয়। উল্লেখ্য আরও একটি কথা এই নৈতিকতা পুরোনো রক্ষণশীল মনোভাব নয়। আধুনিক যুগের মানবমূল্যবোধের বিবর্তনের সঙ্গেই সেই নীতিবোধেরও ঘটেছে রূপান্তর।

যেমন ধরা যাক বিবাহ-বিচ্ছেদ। মধ্যবিত্ত ও উচচবিত্ত বর্গের মধ্যেই বিবাহ-বিচ্ছেদ জনিত পরিস্থিতি টাকা-পয়সা , আইন আদালত, পুত্রকন্যার অধিকার ইত্যাদি বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে । দরিদ্র - বর্গের মানুষের বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিব াহের ক্ষেত্রে নৈতিকতার ধারণা ও সংস্কার দুইই যথেষ্ট আলাদা। আধুনিক জীবনে বিবাহ বিচ্ছেদের স্বাভাবিকতা স্বীকার করে নিয়েছেন প্রফুল্ল রায়, আজকের যুগে, যখন মানুষের ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য অনেকটাই স্বীকৃত ; নারী ও পুষের আত্মমর্যাদ াবোধ অনেকটাই সমান এবং নারীও উপার্জনক্ষম— তখন মধ্যবিত্ত বর্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ এক সামাজিক বাস্তবতা। বিবাহ-বিচ্ছিন্ন নারী ও পুষ পুনরায় ভালোবাসবে এবং বিবাহ করবে— এতেও লেখক কোনো নীতিবাদী নিষেধ আরোপ করেননি। কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের চাপ যে সর্বাধিক নিষ্ঠুর হয়ে বাজে সন্তানের উপর— এই সত্যটি তিনি বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন আমাদের । নৈতিকতার আরোপ সেখানেই । বিবাহ-বিচ্ছেদ যে অনেকক্ষেত্রেই একটু বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে, একটু আত্মত্যাগ করলে এড়িয়ে যাওয়া যায়— এবং গেলেই ভালো-এ কথাটি লেখক বেশ সরলভাবেই বলে দিয়েছেন।

'জন্মদাত্রী' গল্পের ধনী-সন্তান রাহুল ভালোবেসেছে বিবাহ-বিচ্ছিন্ন পারমিতাকে । সে ভালোবাসা কৃত্রিম নয়। পারমিতার

শিশুকন্যাকেও ভালোবেসে গ্রহণ করতে সে প্রস্তুত। কিন্তু রাহুলের বিপুল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মা পারমিতাকে মেনে নিলেও প
ারমিতার কন্যাকে কিছুতেই সংসারে আনতে প্রস্তুত নন। রাহুল সরাসরি মা-কে অমান্য করতে পারল না। কিন্তু কোনো অ
াপোসেই রাজি হল না পারমিতা । রাহুল যদি মা-কে ছেড়ে আসতে না পারে তাহলে তার বালিকা কন্যাকে ছেড়ে থাকার
প্রশ্নই ওঠে না। সে ফিরিয়ে দেয় রাহুলকে।'মলির জন্য ' গল্পে বিবাহ-বিচ্ছিন্ন দম্পতি বালিকা কন্যার মুখ চেয়ে, খানিকটা ভ
ালোবাসার টানেও পুনর্মিলিত হয় । পড়তে মিষ্টি লাগলেও খুবই প্রথাসিদ্ধ সুখান্তক আখ্যান । জটিলতার আবর্তগুলিকে
এড়িয়ে যাওযা হয়েছে । এ জাতীয় গল্প আরও আছে । 'ডোনার জন্য ' গল্পে বিবাহ -বিচ্ছিন্ন জয়ন্তী চেষ্টা করেও কন্যাকে
নিজের কাছে রাখবার অধিকার পায়নি । বংশের মেয়েকে নিজেদের অধিকারে রাখবার অভিলাষে আদালতে গিয়ে
জয়ন্তীকে চরিত্রহীনা বলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে এসেছেন তার শিক্ষিতা , ব্যক্তিত্বময়ী শাশুড়ি। জয়ন্তী কেবল মেয়ে ডোনাকে
দেখে যেতে পারে সপ্তাহে এক দিন। কিন্তু পাঁচবছর পরে সেই শাশুড়িই জয়ন্তীকে ডেকে বলেন ডোনাকে নিজের কাছে
নিয়ে যেতে । কারন ডোনার বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করেছে। ডোনাকে জত্ন করে না কেউ। এই পর্বের একটি ভালো গল্প দুর্বে
াধ্য। মাধুরি বিবাহবিচ্ছেদের পরে বিবাহ করেছে সুরজিৎ -কে । সুরজিৎ স্ত্রী-র আগের বিবাহ সম্পর্কে কোনো ঔৎসুক্য
দেখায় না। সে মাধুরীকে বলেছে যে অতীতের দিকে সে তাকাতে চায় না মাধুরী তাই তার পূর্ব বিবাহজাত কন্যার সঙ্গে স
ম্পর্ক রাখে খুব গোপনে । সেই মেয়ের বিয়ের রাতে তাকে যেতেই হল । সুরজিৎকে গোপন করে , নিজের মায়ের
অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে সেই বিয়েতে গেল মাধুরী। ফিরে এসে দেখল গম্ভীর সুরজিৎ বসে আছে তার অপেক্ষায়।
ভীত কুণ্ঠিত মাধুরীকে সে বলে অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার কথা সে বলেছিল ঠিকই , কিন্তু মেয়ের বিয়েতে যেতে না
দেবার মতো নিষ্ঠুর মানুষ সে নয় । মাধুরীর দ্বিতীয় দাম্পত্য সফল হয়েছে --কিন্তু মনের মধ্যে এই সত্যটি জাগে যে
পরস্পরের কাছে তারা নির্ভরতার আধার হতে পারে নি ।

নারী ও পুষ সম্পর্কে বহু বিচিত্র দিক উঠে এসেছে প্রফুল্ল রায়ের গল্পে। বিবাহ - বহির্ভূত প্রেমের সম্পর্কের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি
কোনোকোনো গল্পে লক্ষণীয়। এই ক্ষেত্রে লেখকের নৈতিকতার বোধ ভারতীয় মনের সংস্কারবদ্ধ রক্ষনশীল অনুশাসনের
অনুবর্তী নয়। ভারতীয় সমাজে , যেখানে এখনও বহুলাংশে অভিভাবকদের স্থির করা বিবাহ ঘটে থাকে , অনেকক্ষে.এই
অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ---সেখানে দাম্পত্য সম্পর্ক বহু ক্ষেত্রেবাসরোধী বন্ধন হয়ে উঠতে পারে এবং হয়ে ওঠে ---এই
সত্য তিনি অনায়াসেই স্বীকার করেছেন।
নারী পুষ সম্পর্ক বিবর্তনে আরেকটি গল্পের উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। গল্পের নাম একটি শব্দের মানে। গল্পের ন
ায়ক ও তারপ্রনয়িনি জয়তী বেশ কয়েক বছর ধরে পরস্পরের বাগদত্ত কিন্তু চাকরি নেই বলে বিয়ে করতে পারছে না। বিবা
হিত দাদার সংসারের অবাঞ্ছিত সদস্য হল ছেলে টি আর জয়তী মামা সংসারে আশ্রিত। মাঝে মাঝেই পরিস্থিতি অসহ
হয়ে ওঠে । পরস্পরকে বোঝায় তারা অ্যাডজাস্ট করে নাও । এক এক্সপোর্ট -ইমপোর্ট ব্যবসায়ীর অপিসে যোগাযোগ
করতে যাবার সময় জয়তীকে সঙ্গে নিয়েই গেল নায়ক । মালিক দেখল দুজনকেই । কিছুকাল ঘুরিয়ে কাজের প্রস্তাব দিল
জয়তীকে । ততদিন তারা গোপনে বিয়ে করেছে । কিন্তু চাকরির অভাবে বাধ্য হয় বিচ্ছিন্ন থাকতে । মালিকের এই প্রস্তাব
নিহিত অর্থ অনুমান করেও জয়তী চাকরিটা নেয়। দুজনেই ভাবে একটু অ্যাডজাস্ট করে চললেই হবে। ক্রমে জয়তীর অফিস
থেকে ফিরতে দেরি হয়। তাকে দেখা যায় মালিকের সঙ্গে এখানে ওখানে । এক রাত্রে ক্ষুব্ধ স্বামীর অভিমান ও অভিযে
াগের সামনে জয়তী শান্ত কাঠিন্যে বলে ----স্বামী চাকরি পেলেই সে ছেড়ে দেবে এই কাজ, ততদিন অ্যাডজাস্ট করতেই
হবে । আর কী উপায় আছে ? অ্যাডজাস্টমেণ্টএর কঠিন ও নির্মম পাক ক্রমেই কঠিন ভাবে জড়িয়ে ফেলেছে দু- জনকেই ।

সে সব গল্পে নর নারী সম্পর্ক প্রধান নয় , মধ্যবিত্ত সমাজের সেই অ্যাখানগুলিতে সাধারনত এক পুষ চরিত্র হয় অবলম্বন।
প্রফুল্ল রায় বাংলার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কাছাকাছি এসেছেন ও থেকেছেন । তাঁর সময়ে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে অনেক
সৎ মানুষও দেখেছেন যাঁদের কাছে নিজের স্বার্থ তো নয়ই , দলীয স্বার্থে ক্ষুদ্রতাও কোনো দিন সমর্থন পায়নি , । এই মনে
াভাবের জন্যই ক্রমে পাটিতে তাঁরা হয়ে উঠেন বিচ্ছিন্ন । এমনকি অবাঞ্ছিত । এই চরিত্রদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অনুভব করা য
ায় । এই গল্প গুলি ঘিরে আরও একবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে ---ওদেশের রাজনীতির ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরতা , পাটি

পলিটিক্সের' চাতুর্য , নীচতা , হিংস্রতা । বোঝা যায় নির্বাচন সংক্রান্ত বিবিধ রাজনৈতিক খেলা সম্পর্কে কতটা জানতেন প্রফুল্ল রায় ।

দুই ধরনের দুটি গল্প উল্লেখ করছি । প্রথম গল্পটি বেশ গল্পরস প্রধান । নাম 'মেদন্ড' । এককালের স্বাধীনতা -সংগ্রামী , আদর্শবাদী রাজনৈতিক কর্মী ভূপতিমোহন কখনও নিজের স্বার্থে রাজনীতিকে ব্যবহার করেন নি । ফলে তাঁর রোগ ও অভাব পীড়িত সংসারেমেয়ে সবিতার অনিয়মিত ও সামান্য রোজগারই একমাত্র ভরসা । অনেক দিন কেটে গেছে । ভূপতি মোহন দূরে সরে গেছেন রাজনীতি থেকে ; কিন্তু মানুয় এখনও শ্রদ্ধা করে তাঁকে । সম্প্রতিক কালের এক নির্বাচনে দুনীতিগ্রস্ত এক ব্যক্তি তার পক্ষে নির্বাচনীসভায় বক্তৃতা দেবার জন্য শেষ পর্যন্ত রাজি করায় ভুপতিমোহনকে। মুহূর্তের দুর্বলতায় কন্যার একটি চাকরির জন্য আর্জি জানাবেন মনে করে রাজি হয়ে যান ভুপতিমোহন। কিন্তু সভার সময় যত এগিয়ে আসতে থাকে ততই উদঘাটিত হতে থাকে ভোটপ্রার্থীর স্বরূপ। শেষ পর্যন্ত আর পারেন না ভূপতি মোহন । সভায় দাঁড়িয়ে সত্যভাষনে নিজের মনের দুর্বলতাও স্বীকার করেন । জনতাকে অনুরোধকরেন নিজেদের বিবেক অনুসারে ভোট দিতে । পিতার দীপ্ত মূর্তি দেখে তাঁর সঙ্গে আসা সবিতার মন গর্বে ও স্বস্তিতে ভরে ওঠে ।

দ্বিতীয় গল্প টি মৃত্যুর এপারে এবং ওপারে '------ এক আত্মনিবেদিত রাজনৈতিক নেতার পাটি বিছিন্ন হয়ে যাবার বিবরণ ।তাঁর সততাই তাঁর সঙ্গীদের বিরূপ করে তোলে । এই গল্পে কোনো বিশেষ ঘটনা নেই । এক উজ্জ্বল দলনেতার স্তিমিত ম্লান এক মৃত্যুর দৃশ্য । যেখানেশ্মশানে এসেছে কেবল এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় আর দলীয় কর্মী এক মহিলা ---একদিন তারই মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে অসম্মানিত হয়েছিল সেই সংগঠন নেতা । এদেশের রাজনৈতিক চিত্রটা প্রায় কোনো কথাশিল্পীকেই সমর্থনযোগ্য কোনো সত্ত্ব দেয় না ----প্রফুল্ল রায় ও ব্যতিক্রম নন ।

প্রফুল্ল রায়ের লেখক মানসের পর্যবেক্ষণ এদেশের বিভিন্ন সামাজিক শ্রেনীকে যাথার্থ্যে উদ্ভাসিত করে তুললেও তাঁর শিল্পী- চিত্তেরঝোঁকটা সম্ভবত মানুষকে ব্যক্তিরূপে তুলে ধরবার দিকেই। এই মনোভাব ছিল রবীন্দ্রনাথেরও। চরিত্র গুলিকে শ্রেনীপ্রতিনীধি করে তুলতে চাইতেন না একেবারেই । একদা এক মহিলা 'যোগাযোগ ' উপন্যাসের কুমুকে ঘিরে মেয়েদের সংসার সংকটের প্রশ্ন তুললে তিনি বলেছিলেন--কুমু কেবলই কুমু । এই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বেই তার পরিচয় । আমরা আগেই দেখেছি যে প্রফুল্ল রায় শ্রেনী মানুষকে সাফল্যের সঙ্গেই প্রস্ফুটিত করতে পারেন । করেছেনও । কিন্তু তবুশ্রেনী মধ্যে ব্যক্তিকে তুলে ধরতেও তাঁর আগ্রহ সমধিক ।যেক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা দেয় এক শৈল্পিক সমস্যা । প্রফুল্ল রায় লেখক রূপে কিছুটা পরম্পরাসিদ্ধ নীতি বোধে বিশ্বাসী । যে ব্যক্তি - মনু ষকে তিনি তাঁর গল্পের কেন্দ্র - চরিত্র রূপে গ্রহণ করবেন সেই ব্যক্তি একজন খারাপলোক হবে --এটা তাঁর মনোমত হয় না । খারাপ লোককে খারাপ বলেই দেখতে শু করেন তিনি -- কিন্তু ক্রমেই সে ভালো হয়ে ওঠে । গল্পের শেষে মানবিকতার জয় দেখাতে ভালোবাসেন তিনি। পার্থিব বাস্তবতার দিক থেকে ব্যাপারটি সর্বদা বিশ্বাসযোগ্য হয় না । গল্পটি থেকে যায় দুর্বল । যেমন ধরা যাক 'পাওয়া ' গল্পটি । গোয়ার খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত জোহান নামের লোকটি সব দিক থেকেই খারাপ ---" তিনটি হত্যা , নোট জাল , জালিয়াতি । স্ত্রীঘটিতব্যাপার ---পেনাল কোডের পৃষ্ঠাগুলিতে যত রকম অপরাধের তালিকা আছে তার কোনোটাই বাদ দেয়নি সে । একবার ধরাপড়লে ফাঁসি তাঁর নিশ্চিত ।" পালাতে জোহান এসে পৌঁছায় মহারাষ্টের প্রত্যন্ত সীমার এক গির্জায় । সেখানে দেখা পায় সন্ন্যাসিনী রেবেলা -র --যে রেবেকাকে একদিন সে গ্রাম ছাড়তে বাধ্যই করেছিল । গ্রামে থাকলে তার কামার্ত ভোগাকাঙক্ষার শিকার হতেই হত রেবেলা -কে । কিন্তু এই গির্জায় জোহানকে দেখে ভয় পেল না রেবেলা । ঘৃণাও করল না । তাকে দিল খাদ্য ও আশ্রয় । দুদিন পরে সেই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া কলেরা-র সেবার জন্য রেবেলা ডেকে নিল জোহানকে । তারপর থেকে জোহান রেবেলার পাশে দাঁড়িয়ে মানুষের সেবা করেই চলেছে । রেবেলাকে সে পায়নি কিন্তু "সেদিন না পাওয়াটা আজ কত বড় পাওয়া হয়ে ফিরে এসেছে ।" এখানেই গল্পের শেষ। এমন ঘটতে পারে লাখে একটা । কিন্তু গল্পের একজনজালিয়াত খুনী ধর্ষণকারীর এই সলরেখায়িত ভালোত্বে পৌঁছে যাওয়া --খুব স্বাভাবিক হল কি ? এ গল্প উঠে এল না পাঠকের বিশ্বাসের স্তরে ।

আবার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যেখানে শ্রেনী - চালচিত্রে ব্যক্তির মূর্তি খোদাই করা হয়ে গেছে শিল্প - জাদুরসোনার ছেনির কাকাজে । গল্পের নাম 'বাঘ'। , বুদ্ধদেব দাসগুপ্তের নির্মিত স্মরণযোগ্য চলচিচত্র 'বাঘবাহাদুর ' এর কেন্দ্র আখ্যান । মহারাষ্ট্রের কার্পাস চাষিদের গরিব গ্রাম নোনাপুরা । প্রতিবছর সেখানে আসে ঘুনুরাম । তার পেশা সং সাজা । বাঘের বেশধরে সে অভিনয় করে । আনন্দ পায় গাঁয়ের লোক । এই সং -এর জীবিকা গ্রামীন ভারতে এখনও থেকে গেছে কোথাও কোথাও। নোনপুড়া গ্রামে আছে তার শুভানুধ্যাযী পরিবার এবং সেই পরিবারে আছে এক কৃষ্ণা কিশোরী রতি ।যার কালো তনুদেহ পোর গয়নায় ঝিলিকে ঘুনুরামের বুকের মধ্যে বিদ্যুতের রোশনাই খেলে যায় । কিন্তু একবার নোনপুরায় এসে ঘুনুরাম দেখল ---নতুন এক বাজিকর গাঁয়ে নিয়ে এসেছে জ্যান্ত বাঘ --বাঘ দেখিয়ে মোহিত করে দিয়েছে সকলকে । ঘুনুরামের যত্নের রূপসজ্জা বিফলে যায়; তার নকল বাঘের খেলা দেখতে ভিড় করে না গ্রামের লোক । রতি আর কাছে আসে না তার । একদিন সে সত্যিকারের বাঘকে আহ্বান জানায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে । সেই যুদ্ধে তার অবধারিত পরাজয় । এই গল্পের ঘুনুরামকে একই সঙ্গে শ্রেনীর মানুষ আর ব্যক্তিরূপে অপূর্ব দক্ষতায় জীবন্ত করে তুলেছেন লেখক । গরীব ঘুনুরাম , তার পেশা অচল হয়ে যাবার অসাহায়তা , গ্রাম -ভারতের এক বাস্তব চিত্রণ আর ক্ষুব্ধ-ব্যর্থ এক প্রেমিকের মরিয়া নৈরাশ্যজনিত প্রতিত্রিয়া একই সঙ্গে মূর্ত হয়েছে গল্পটিতে ।

এই ধরনের গল্প অনেক আছে । আর একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছি । সযত্নে ফুটিয়ে তোলা একটি পরিবেশ ও পরিস্থিতি গল্পটিকে আর্কষক করে তুলেছে । গল্পের নাম 'জাহান্নামের গাড়ি '। গাড়িওয়লা মাসুদ জান থাকে পাক সার্কাস -এ ; তার আছে পুরানো মডেল এর একটি গাড়ি 'ভিনটেজ কার ' । প্রতিবছর ভিনটেজ কার র‍্যালি -তে প্রাইজ পায় । মোটর গাড়ি আর গাড়ির চালক - মালিক কে নিয়ে অন্তত দুটি স্মরণীয় গল্প আছে বাংলা সাহিত্যে । তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিযান ' আর সুবোধ ঘোষের অযান্ত্রিক ' । প্রফুল্ল রায়ের এই গল্পটিকেও অনেকটা সেই পর্যায়ে রাখা যায় । মাসুদ জান এর চরিত্রটিকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি । সেই গাড়ি কিনতে আসে এক উঠতি বড়লোক । গাড়ি বিত্রির শর্ত গাড়ির সঙ্গে চালককেও নিতে হবে --এই শর্তে রাজি হযে যায় ত্রেতা । গাড়িতে সে নিজে চড়বে না ,চড়বে তার রাখনি চম্পা । তাতে আপত্তি নেই মাসুদ এর । এককালে তার গাড়িতে খানদানি ঘরানার বাঈজিরা অনেক চড়েছে । এই সূত্রে পুরানো স্মৃতির কয়েকটি টুকরো চমৎকার ব্যবহার করেছেন লেখক । গাড়ি নিয়ে চম্পা বাঈ -এর মুল্ক এ যাবার জন্য প্রস্তুত হয় মাসুদ জান । কিন্তু পথে সে জড়িয়ে পড়ে অন্য সমস্যায় । এক গাঁয়ে আটকে রাখা চারটি মেয়েকে বাঁচাবার জন্য ব্যবহার করতে হয় গাড়িটি । সেই মেয়েদের তুলে এনে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল দেহজীবিনী হওয়ার জন্য। বিপদের মুখে গাড়িকে ভালো কাজে ব্যবহার করতে পেরে মনটাই অন্য রকম হয়ে যায় মাসুদ জান -এর । গাড়িতে আর সে কখনও খারাপ লোকেদের তুলবে না । মাসুদ জান এর মনের পরিবর্তন পূর্বে উল্লিখিত জোহান -এর পরিবর্তনের তুলনায় যুক্তিগ্রাহ্য তবু গল্পটি কিছুটা সাজানো । আর,এই সাজানোর প্রধান উদ্দেশ্য হল মাসুদ জানকে একজন স্বতন্ত্র মানুষ হিসাবে তুলে ধরা ।

প্রফুল্ল রায়ের অনেক গল্পে বারাঙ্গনারা এসেছে প্রধান ভূমিকায় । হিন্দীভাষী অঞ্চলের জবানে 'রেন্ডি'এবং 'রেন্ডিটোলি ' তাঁর বেশ কয়েকটি গল্পের উপজীব্য । প্রত্যাশিত ভাবেই দেহজীবিনীদের মানবিক রূপটি ফুটিয়ে তুলতেই আগ্রহ তাঁর। মেটের উপর সুলিখিত গল্প 'শেষ যাত্রা।' বারাঙ্গনা পল্লীর সঙ্গে কোনো- না কোনো চিকিৎসকের প্রায়ই হার্দিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যদি সেই চিকিৎসক একটুসহৃদয় হন ; যদি বেশ্যা বলে না দেখে মানুষ ও রোগী বলেই দেখেন সেই মেয়েদের; যদি সমাজে একই সঙ্গে থাকা এবং না থাকা এই মেয়েদের প্রতি একটু সহানুভূতি থাকে তাঁর ---- তাহলে সেই ডাক্তারকে অন্তরের সব ভক্তি উজাড় করে দেয় সেই মেয়েরা । কেষ্টভামিনী আর তার সঙ্গিরা খবর পেল তাদের একান্তই আপন ডাক্তার ভুবন চক্কোত্তি শেষ শয্যায় । একটু সমাজ ছাড়া বলে , আর দেহজীবিনীদের পাড়ায় যায় বলে ভুবন চক্রবর্তীর বাড়ির লোকেরা খোঁজ নেয় না তার । কেষ্টভামিনীরা যায় সেখানে । ডাক্তারডাকে কিন্তু তখন আর সময় নেই । মৃত্যুর পর ভুবন চক্রবর্তীর শেষ কৃত্য করবারও লোক নেই কেউ । তখন সাতাশটি দেহজীবিনী মেয়ে খই ছড়িয়ে , হরিধবনি দিয়ে । খাট কঁ

াধে নিয়ে পৌঁছায় শ্মশানে । বামুনের মুখে আগুন ছোঁয়াতে ও দ্বিধা করে না তারা। "লরকে তো ডুবেই আছি । বামুনের মুখে আগুন ঠেকিয়ে আর কত ডুবব ! মরার পর আমাদের কী হবে তা লিয়ে ভেবে কী হবে !" শ্মশান পুরোহিত বহু দিক থেকে জীবনকে দেখেছেন । বারাঙ্গনা কেষ্টভামিনী ব্রাহ্মণ ভুবন চক্রবতীর শ্রাদ্ধ করবে --তাতে কোনো আপত্তি করে না তিনি । কেষ্টভামিনী তথাকথিত দেব ভাষায় লেখা মন্ত্র দিয়ে পড়ে । চরাচরে ছড়িয়ে যায় সেই সুর ।

অপর একটি গল্প 'নরক'। রেন্ডিটোলি-র সাগিয়া তার নিজের অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র যায় বছরে সাত আটবার । কারন ক াঠের কারবারি এক বড়লোকের তাকে প্রয়োজন হয় । পথ দুর্গম ।ভরা বর্ষার নদী পার হতে গিয়ে ডুবে যায় নৌকো । কে ানো ক্রমে জল থেকে ওঠে এবং আর একজন জলমগ্ন ও অচৈতন্য ব্যক্তিকে টেনে তোলে সাগিয়া । পথে ছেড়ে যেতে পারল না , মানুষটিকে পাড়াতেই নিয়ে আসে । তার সঙ্গিনীরা প্রথমে অশ্লীল ইঙ্গিত করলেও শেষ পর্যন্ত মরনাপন্ন মানুষটিকে সমবেত শুশ্রূষায় বাচিঁয়ে তোলে। জানতে পারে এই এলাকার সুপন্ডিত সদ্ব্রাহ্মণ শিউশঙ্কর শাস্ত্রী তাদের ঘরে । শাস্ত্রীর জ্ঞান ফেরে । সব জানতে পেরে কয়েক মুহুর্ত যন্ত্রনা ভোগ করেন মনে মনে । তরাপর শান্ত হয়ে যান ।সাগিয়ার হাতের অ ানা দুধ পান করেন। বিশ্রাম নিয়ে মেয়েদের আর্শীবাদ করেবেরিয়ে পড়েন পথে। দুটি গল্পের বয়নেই প্রফুল্ল রায়ের শিল্পী মনের মানব-নীতির প্রবণতা ধরা পড়ে । হিন্দুত্ব বাদী ব্রাহ্মণত্বের পবিত্রতাবোধের একটা স্বাভাবিক স্বীকৃতিও যেন আছে তঁ ার মনে । কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের গোঁড়ামি না থাকার এবং দরিদ্র দলিত বর্গের মানুষকে মানুয়ের অধিকার দেবার প্রশ্নে তাঁর ম ানবতাবাদী উত্তরের দ্বিধাহীনতাও অনুভব করি আমরা ।

আমরা প্রথমেই বলে নিয়েছি --প্রফুল্ল রায় যথেষ্ট জনপ্রিয় লেখক । সর্বশ্রেনীর পাঠকের কাছেই আছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা । এইজনপ্রিয়তা যাঁরা অর্জন করেন , তাদের সকলের লেখাতেই পরিস্ফুট হয় একই ধরনের কয়েকটি লক্ষণ । এই লক্ষণের মধ্যে প্রথম হল গল্পের গঠনে একটি নিদিষ্ট আখ্যান থাকা। উপাখ্যান বলতে আমরা বুঝি ঘটনার বিশিষ্ট বিন্যাস যেখানে থ াকবে বর্ণিত ঘটনাক্রমের কয়েকটি নিদিষ্ট পর্যায় । সাধারনভাবে পাঁচটি পর্যায়ে একটি আখ্যানকে বিন্যস্ত করা যায় । প্রথমে গল্পের প্রধান চরিত্র বা চরিত্রবৃন্দের সঙ্গের পাঠকের পরিচিতি সূত্র গড়ে তোলা ; দ্বিতীয় পর্বে ঘটনা র অগ্রগতি ঃতৃতীয় পর্বে ঘটনা ধারার এক ষীর্যবিন্দু যেখানে টেনশন হয়ে ওঠে তীব্রতম ; চতুর্থ পর্বে আসে ঘটনার সংবৃতকরণ --যাকে ঘটন াগতির অবরোহন ও বলা যায় ;এবং শেষভাগে থাকে পরিনাম । আখ্যানে এই পঞ্চসন্ধি বিন্যাস নাটকের ক্ষেত্রে সর্বাধিক স্পষ্টতায় পরিদৃষ্ট হয় । কিন্তু যে কোনও আখ্যানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে এই পঞ্চসন্ধিবিন্যাস আখ্যান ম াত্রেরই ধর্ম । ছোটগল্পের প্রধান নির্ভর আখ্যানে নয় , উপলব্ধিতে । অর্থাৎ আখ্যান যদি কোনও একটি উপলব্ধি জাগিয়ে তুলতে না পারে তা হলে একটি ছোটগল্পের বয়ন-কৌশল ব্যাহত হয় । আখ্যান ধর্ম একটি ছোটগল্পের প্রধান অবলম্বন কখনই নয় । কিন্তু সাধারন পাঠক গল্পের মধ্যে আখ্যানেরই সন্ধান করেন । গল্প শুনতে ভালোবাসেন অধিকাংশ পাঠক । তাই গল্প - ভাগটি অস্পষ্ট থাকলে ছোট গল্প খুব জনপ্রিয় হতে পারে না ।যদি কোনও গল্পকার কেবলই মানব মনের অন্তর্গত --তলের অনুভব -স্রোতকে ভাষায় ব্যক্ত করেন তাহলে গল্প হিসাবে তা খুব জনপ্রিয় না হওয়াই স্বাভাবিক । বাংলা উপন্যাসের দিকে তাকালেই দেখতে পাই তারাশঙ্কর , মানিক আর বিভূতিভূষণের উপন্যাসের তুলনায় জগদীশ গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ , গোপাল হালদার অনেক কম জনপ্রিয় । সাধারন পাঠক রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' কিংবা 'সমাপ্তি' যতট া নিতে পারবেন ততটা পছন্দ করতে পারবেন না 'ব্যবধান ' কিংবা 'এক রাত্রি'। এমন কী ক্ষুধিত পাষান গল্পের সৌন্দর্য ও অনেক পরিমানে তাঁদের কাছে অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে।

প্রফুল্ল রায় গল্পের আখ্যান বিষয়ে প্রায় কখনই কোন ঝুঁকি নেন নি । পরীক্ষামূলকতাও কম। তিনি সরাসরি প্রত্যক্ষ গল্প ঘটনা বিন্যাসে একটি সাবয়ব আখ্যান গড়ে তোলেন । সে আখ্যানের সুনিদিষ্ট সূচনা থাকে ; সেই সঙ্গে থাকে ঘটনা গতির আরোহন শীর্ষবিন্দু এবং অবরোহন । আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত যতগুলি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি তার প্রত্যেকটিতেই আমাদের এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে।

কেবল আখ্যানের উপস্থিতিই নয়, সেই আখ্যান যাতে মধ্যবিত্ত বাঙালির সমকালীন চিবোধ এবং ঔচিত্যেবোধের নৈতিকত াকে অতিত্রম না করে সে ব্যাপারেও তিনি সচেতন । অথার্ৎ কেবল গল্প নয় , মধ্যবিত্ত পাঠকের মনোরম মনে হওয়ার মতো গল্প । অবশ্য এখানে স্বীকার করতে হবে যে দরিদ্র -বর্গের মানুষের বাস্তবতা এবং দুর্দশা নিয়ে যে সব গল্প তিনি লেখেন ত া মধ্যবিত্ত পাঠকের একটি অংশের কাছে খুব বেশি আকর্ষক হয়ে ওঠে না । সাধারন মধ্যবিত্ত পাঠক সাধারনত নিজেদের শ্রেনীর গল্প শুনতেই পছন্দ করেন । এব্যাপারে প্রফুল্ল রায়ের গল্প সম্ভারে অবশ্যই দুটি ভাগ আছে । দরিদ্র বর্গকে অবলম্বন করে লেখা গল্পগুলিতে তিনি ভারতের জনশ্রেনীর মানুষকে যতটা গভীরভাবে চিনেছেন সেই অভিজ্ঞতাকেই শিল্পিত করতে চান।

কিন্তু গল্প পরিনামের ক্ষেত্রে প্রফুল্ল রায়ের ঝোঁক পাঠকের চিত্তকে তৃপ্ত করবার দিকে । সন্তানের জন্য বিবাহ - বিচ্ছিন্ন দ ম্পতি পুনর্মিলিত হয় ! দুশ্চরিত্র ব্যক্তি প্রায় অলৌকিকভাবে সচচরিত্র হয়ে ওঠে ; ব্রাহ্মণ পন্ডিত বারাঙ্গনার হাতে খাবার খেতে দ্বিধা করেননা এবং তাদের ঘৃনা করেন না; গরিব মানুষ অভাবের তাড়না সত্ত্বেও নিজের স্বাথের উপর স্থান দেয় ম ানব সেবাকে । এই ধরনের উপসংহার পাঠকের মনকে খুসি করে ; আমাদের মনে হয় শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবী বাসযোগ্য আছে । জনপ্রিয় গল্পকার হওয়ার খুব বড় একটি পদ্ধতি হল গল্পের পরিনামে এই নিশ্চিন্ততা । তবু বলব , কোথাও কোথ াও প্রফুল্ল রায় মনোরম আখ্যানেই এই সুনিশ্চিত সিদ্ধি -কৌশল পরিহার করেছেন । এবং সেই সব ক্ষেত্রে তাঁর গল্প হয়ে উঠেছে ক্ষুরধার এবং সাহিত্যেরসিক পাঠকের কাছে অধিকতর আস্বাদন -যোগ্য ।

প্রফুল্ল রায়ের গল্পে জনপ্রিয়তার উপাদান হিসাবে যথেষ্ট বেশি ব্যবহৃত হয় আরেকটি অমোঘ পদ্ধতি । সে পদ্ধতি হল র ূপের বর্ণনা । তাঁর লেখনীর অভ্যস্ত চলনই হল রূপ -বর্ণনাময় । যে কোনও মানুষকেই চরিত্র হিসাবে পাঠকের সামনে অ ানবার সঙ্গে সঙ্গেতিনি তার দৈহিক রূপ এবং 'অ্যাপিয়ারেন্স' এর একটি ছবি এঁকে দেন । মোটের উপর সেই ছবি যথার্থ ; কিন্তু রূপ যৌবনের সৌন্দর্য বর্ণনার প্রতি তাঁর যেন কিছু দুর্বলতাকেই লক্ষ করা যায় । আমরা দৃষ্টান্ত দেব পাঁচটি ----

১। জয়ন্তীর বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ । শ্যামবর্ণ । এই বয়সেও ভরাট , লম্বাটে মুখ । মাঝারি ধরনের হাইট । ত্বক টান মসৃন । নাক ঈষৎ মোটা , ঠোঁট দুটি পাতলা , চিবুকের ডৌলটি চমৎকার ডান গালে মসুর ডালের মতো লালচে একটা তিল - ঘন পালকে ঘেরা বড় বড় চোখ দুটিতে গভীর দৃষ্টি। অজস্র চুল একটা বড় খোঁপায় আটকানো । পরনে হালকা গোলাপি রঙের প্রিন্টেড শাড়ি , যার জমিতে ফুল ---লতাপাতার নকশা । বাঁ হাতে ঘড়ি , চান হাতে খাঁজ -কাটা সোনার কঙ্কন গল ায় লকেটওলা স চেন ছোট্ট হীরের নাকছবি । তার বাঁ কাঁধ থেকে লেডিজ ব্যাগ কোমরের কাছে ঝুলছে । ডান হাতে পলিথিনের বড় একটা প্যাকেট ।'

(ডোনার জন্য)

যে নারীর এই বর্ননা দেওয়া হয়েছে তার ভূমিকাটি কী? সে বিবাহবিচ্ছিন্ন এক মা , যে তার বালিকা কন্যাকে দেখার জন্য প্রতি শনিবার বিকালে তার প্রাক্তন শ্বশুর বাড়িতে আসে । এই সেদিনও সে তা-ই এসেছে । এক্ষেত্রে জয়ন্তীর ডানগালে তিল আছে কিনা , চোখ ঘন পালকের ঘেরা কিনা , তার সোনার কঙ্কনে খাঁজকাটা আছে কিনা , গলার চেনের লকেট অ াছে কিনা এবং নাকের নাকছবি হিরের কিনা ---এই তথ্য গুলিতে খুবই - কি প্রয়োজন ? এই বর্ণনা কেবল রূপ দেখে প াঠকের খুশি হওয়ার জন্যই। গল্পের বিষয়বস্তু এবং কেন্দ্রীয় অনুভবের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই ।

২। কালো রং মেয়েটার । কালো বললে সব বলা হয় না তার গা থেকে তীক্ষন এক দ্যুতি যেন ঠিকরে বেচেছ । মনে হয় মেয়েটাসর্বাঙ্গে ঘানিতেল মেখে গেছে । আদিবাসী মেয়েদের মতো উদ্দাম এবং অজস্র স্বাস্থ্য তার । নাক মুখ বেশ টানা-ট ানা , তীক্ষন । হাতেপোর কাঙনা, নিটোল গলাটি বেষ্টন করে পোর বিছেহার। কালো দেহে পোর ছটা পের হাট বসিয়ে

দিয়েছে যেন।

মুঠোর ভেতর বেড় পাওয়া যায় রতির কোমরখানি এমনই স । কোমরের নিচের দিকে বিশাল অববাহিকা , ওপর দিকে ভরাট , মাংসল বুক ।হলুদ রঙের ওপর কালো কালো ফুলের ছাপওলা একটা শাড়ি তার দেহটিকে সাপটে ধরে রয়েছে ।

মেয়েটা যেন কালো ময়ূরী । চোখের দৃষ্টিতে তার ঘোর-লাগা , তার মধ্য থেকে কৌতুকের খানিকটা দীপ্তিও বিচ্ছুরিত হচ্ছে।'
(বাঘ)
এই গল্পে আদিবাসী তণীর দেহ -সৌন্দর্যকে যে অনুপুঙ্খে বর্ননা করেছেন প্রফুল্ল রায় তার মধ্যে আতিশয্য আছে ,কিছুটা যৌন -আকর্ষনের দিকেও নির্দেশ করা হয়েছে সচেতনভাবে । গরিব আদিবাসী মেয়ে, তার শারীরিক অঙ্গ-সংস্থানে যে সৌন্দর্যের বর্ননা তিনি করেছেন সেখানে মর্ত্য দৃষ্টির চেয়েও বেশি স্পষ্ট হয়েছে নারী -শরীরকে পাঠকের চোখে প্রত্যক্ষ করে তোলবার প্রয়াস , আমরা এ প্রসঙ্গটি শেষ করব এখানেই ।প্রফুল্ল রায়ের গল্পে বারবারই এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে ।

৩। 'মাতি-ওমনিটা চালিয়ে এনেছিল রাহুল । দান সুপুষ ছ'ফিটের মতো হাইট । তার লম্বাটে মুখ, চওড়া কপাল ,ব্যাক ব্রাশ চুল উজ্জ্বল চোখ , টকটকে রং --সব কিছুতে এমন এক চি আর আভিজাত্য রয়েছে যা মুহূর্তে তার বংশ পরিচয় জানিয়ে দেয় । খুব বনেদি , বিত্তবান পরিবারে সে জন্মেছে ।'

(জন্মদাত্রী)
৪। 'ওদিকের পাল্লা খুলে যে বেরিয়ে এল যে এক আশর্চ্য সুপুষ । বয়স তিরিশের নিছেই । গায়ের রং টকটকে ফর্সা কিন্তু সাদা নয় , স্বর্ণাভ । দীর্ঘ চেহারা , পিঠটা ঋজু অনাবশ্যক মেদ নেই , চুল সযত্নে বিন্যস্ত । তীক্ষন নাক , লম্বাটে উজ্জ্বল চোখ । চিবুকের মনোরম খাঁজ । সমস্ত দেহের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে একটা হালকা চকোলেট রঙের ট্রাউজার আর বুশ শার্ট পড়েছে ।'
(কাশ্মীর)

৫।'সোমনাথের বয়স তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ । তবে তিরিশ টিরিশের বেশী দেখায় না ছফিটের ওপর হাইট , মেদহীন টান টান , চওড়া মজবুত কাঁধ । হঠাৎ দেখলে তাকে বাঙালি বা ভারতীয় মনে হয় না । তার গায়ের লালচে রঙে, নীলাভ চোখে এবং পাতলা ভুতে ইউরেশিয়ান টাচ আছে।
(মল্লিকা)
শেষ তিনটি উদ্ধৃতিতে বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন পরিবাবের তিনজন পুষের চেহারা ও পোষাকের বর্ণনা আছে । এদের তিনটির মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় । সকলেরই ছয় ফুট হাইট ,গৌরবর্ন দেহত্বক ,চোখ মুখের গড়নের আভিজাত্য । চিশীল পোশাক । প্রফুল্ল রায়ের গল্পে দেখা যাবে নায়ক পুষদের বর্ণনায় ফর্সা রং দীর্ঘ শরীর এবং খাড়া নাক। অনেক ক্ষেত্রে তিনি বলেই দিয়েছেন যে নায়কের চেহারা পুরেপুরি 'এরিয়ান' । আমরা বাঙালিরা আর্য বংশোদ্ভুত রূপের একটা টাইপ মনে মনে ধরে নিই। আবার আদিবাসী নারীর সৌন্দর্যেরও একটা টাইপ আমরা ভেবে নিয়েছি । প্রফুল্ল রায় তাঁর লেখায় এই টাইপ গুলিকে সযত্নে লালন করেন । এ জন্যই অনেক সময় তাঁর গল্পের বর্ণনা -কৌশল যতই জনপ্রিয় , ততটা শিল্পোত্তীর্ণ নয় ।

গল্পে ভাষার ভূমিকা সর্বাতিশায়ী । যে লেখকেরা বিবৃতিমূলক রীতিতে গল্প লেখেন তাঁদের সর্বদাই অন্তত পক্ষে দুটি ভাষার স্তরসম্পর্কে সচেতন থাকতে হয় । একটি তাঁর নিজের বিবৃতির ভাষা অপরটি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মুখের ভাষা । সেখানে

তিনি নিজের ভাষাব্যবহার করেছেন , সেখানে বিশেষ কিছু বলবার থাকে না , মান্য বাংলা ভাষার যে রূপটি সাহিত্যে স াধারনত ব্যবহৃত হয় সেই ভাষাই ব্যবহার করেছেন প্রফুল্ল রায় । তৎসম এবং মার্জিত তৎভব শব্দের সমাহার সেখানে । দেশি শব্দ আছে । কিন্তু প্রাত্যহিকতার মালিন্যে কর্কশতায় অমার্জিত হয়ে যাওয়া শব্দ সাধারনত ব্যবহার করেন না প্রফুল্ল রায় ।তাঁর বর্ণনা মোটের ওপর বাস্তর্বস্পর্শী ।তবে তাঁর বিবরনে সমস্তটাই স্পষ্ট হয়ে যায়-অব্যক্ত ব্যঞ্জনার বিশেষ জায়গ া থাকে না তাঁর সুন্দর -বর্ণনার দৃষ্টান্ত দিয়েছি ।অসুন্দর -বর্ণনার দেওয়া গেল ----।

১। 'মেয়েমানুষগুলো যেখানে বসে আছে সেখানের থেকে খানিকটা দূরে নিজের সামনের দাওয়ায় বসে একা সাপ লুডো খেলছিল কেষ্টভামিনী । বেঢপ মাংসল চেহারা তার , একেবারে ঘাড়ে গর্দানে ঠাসা । গায়ের কালো যেন পালিশ করা এমনই তারজেল্লা ।চাকার মতো গোল মুখ বড় বড় লালচে চোখ , থুতনির তলায় চর্বির তিনটি পুর থাক ।নাকে সোনার ফাঁদি নথ , কানে মাকড়ি , গলায় তেঁতুল পাতা হার ।'
(---শেষযাত্রা)

২'লগার বয়স উনিশ কুড়ি । রোগা ডিগডিগে পোকায় কাটা চেহারা, গালে খাপচা নরম দাড়ি ,জট পাকানো ক্ষ চুল ঘ াড় পর্যন্ত নেমে এসেছে । সেগুলোর সঙ্গে --জন্মে চিনি বা তেলের সম্পর্ক নেই ।তার পরনে তালি- মারা ফুল প্যান্ট অ ার হাত-কাটা ফতুয়া ধরনের জামা ।
(শেষ যাত্রা)

পফুল্ল রায়ের ভাষা কৃতিত্ব বোঝা যায় সংলাপের ক্ষেত্রে । মোটের উপর তিনরকম ভাষা সংলাপ তিনি ব্যবহার করেছেন প্রথম , পশ্চিমবাংলার মান্য ভাষাভঙ্গীর বাচন যা শিক্ষিত নাগরিক মানুষ ব্যবহার করে থাকেন । দ্বিতীয় পূর্ব বাংলার ম ানুষের মৌখিকভাষাভঙ্গী। তৃতীয় বিহার ও উত্তর প্রদেশের মানুষের মুখের ভাষা। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববঙ্গের ভাষা সরাসরি ব্যবহা করেছেন । কারন সেই ভাষা মোটের উপর পশ্চিমবাংলার বাঙালিরা এখনও শোনামাত্র বুঝে নিতে প ারেন । প্রফুল্ল রায়ের বাল্য-কৈশোরের মুখের ভাষাই ছিল পূর্ব-বঙ্গীয় উপভাষা। তাই অতি সচ্ছন্দে এবং নির্ভুল স্বরায়নে তিনি এই ভাষা গুলি লিপিবদ্ধ করতে পারেন ---।"ভাল কথা ,কথা এর আগে তো আমিন সাহেবের আলাপ -সালাপই কইরা দেই নাই । উনি মুর্শিদাবাদের মানুষ , আমার বন্ধু । আমিন সাহেবকে বলল , আর ও হইল রাজের মিঞা ,বড় ঝিাসী ।আমরা যখন দ্যাশ ছাইড়া যাই অর উপর বাড়িঘর জমিজিরাতের ভার দিয়া গেছিলাম । দ্যাখেন কেমুন সোন্দর পরি (পাহারা) দিয়ে রাখছে ।'
(রাজা যায় রাজা আসে)
কিন্তু হিন্দি লোকভাষার ক্ষেত্রে যখন এসে পড়েছেন প্রফুল্ল রায় তখন আর পুরো পুরি যথার্থ ভাষাভঙ্গী ব্যবহার করতে প ারেন নি । কারন যথাযথ সেই ভাষা লিখলে বুঝতে পারবেন না তাঁর পাঠকেরা । কাজেই দেহাতি হিন্দির সঙ্গে মেশাতে হয়েছে বাংলাভাষা ।উদাহরন --
'মোটেরাম বলে ' বজরঙ্গীশাল জর জিতে গা । যা পহিসা খরচা করছে , ভাবতে পারবি না। ভলিন্টারদরে ঘুরেই খাওয় াচ্ছে পুরী হালোয়া আউর গুলাব জামুন , দুফারে বড়িয়া ভাতকা ভোজন , রাতমে পরেঠা ভাজি বুদ্ধিয়া বলুসাই । ভলিন্টাররা চিল্লিয়ে বজরঙ্গীজির জন্যে গলা দিয়ে খুন নিকলে দিচ্ছে ।'

চুহালাল হাওয়ায় হাত নাচাতে নাচাতে বলে , ' তোর মক্ষিচুরষ কেত্তে পাইসা গের খরচা করবে ! জেতার জন্যে টাকা ওড়াচ্ছে তেলবালা ভোলে চাঁদজি ।যা খিলাচ্ছে পিলাচ্ছে ,সে সব নাম তোর চোদ্দ পুষেও কানে শোনে নি । চোখে দ্য াখে নি ।পুলাও, মালাই , কালাকান্দ, কলকাওাকা রাজভোগ , বাদাম বরফি পিস্তা--"

এভাবেই দেহাতি হিন্দি সংলাপ লিখেছেন তিনি ।মহারাষ্টীয় আর গুজরাটির ক্ষেত্রে দেহাতি হিন্দিই ব্যবহার করেছেন ।

এই মিশ্রণে আমরা আপত্তি করিনা। সাহিত্যের প্রয়োজনে এই কৃত্রিম মিষ্ট ভাষা বহুকাল থেকেই স্বীকৃত ।সতীনাথ ভাদুড়ী থেকে শু করে মহাশ্বেতা দেবী --সকলকেই করতে হয় ।

বর্ণন ভাষার ক্ষেত্রেও প্রফুল্ল রায়ের একটি কৌশল লক্ষণীয়। যে সমাজ যে গোষ্ঠির বর্ণনা তিনি নিজের ভাষায় অর্থাৎ প্রথম পুষের বাচনে উপস্থিত করেছেন --সেখানেও বর্ণনভাষার শব্দ -চয়নে, সেই সমাজ ও গোষ্ঠীতে ব্যবহৃত দেশজ আঞ্চলিক শব্দের দিকেওলক্ষ রেখেছেন ।তাই মাছ ধরা , চাষ , নৌবাহন ,মোটর -গ্যারেজ --ইত্যাদি সম্পর্কিত কাজে যে সব শব্দ প্রচলিত যে গুলি যত্নে বিন্যস্ত করায় তাঁর বর্ণনায় ভাষাতেও গল্পের বিষয়বস্তু অনেকটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে ।

প্রফুল্ল রায় শক্তিমান লেখক ।জনপ্রিয়তার লিপি -কৌশলগুলির দিকে কিছুটা দৃষ্টি রাখলেও তিনি আমাদের সমাজের ব াস্তবতাকেই তুলে ধরেন । সে বাস্তবতা সর্ব স্তরের ।তাঁর চিত্রন যথার্থ । শিল্পী হিসাবে তিনি যে এক সুনীতি কে ধরে রেখেছেন ---তাতে নিজের মতো করে এক দায়িত্বশীল লেখকের ভূমিকাই পালন করেন প্রফুল্ল রায় ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com